Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-III, April 2024, Page No.18-25
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

জীবনভিত্তিক উপন্যাসের ধারায় সোনালি ডানার চিল: একটি বিশ্লেষণাত্মক সমীক্ষা

উজ্জ্বলা সূত্রধর

গবেষক, বাংলা বিভাগ,ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, সূর্যমনিনগর, ত্রিপুরা, ভারত

Abstract:

Jibanananda Das is one of the memorable poets of modern Bengali poetic literature. Introverted Jibanananda always lived in the solitude of poetry in his own world. Sometimes he is lost in the depths of the soul, and sometimes he is absorbed in memory.

We see that Bengali successful novels started to be written from the 19th century, but in the latter half of the 20th century, the writing of novels based on Bengali personal life began. In the 21st century, the tide came in the literature of this stream. Writers of this period have written novels about the lives of various historical figures, like Madhusudan, Nazrul's life. There, in 2009, Suranjan Prananik wrote a 462-page long novel titled 'Sonali Danar Chil', about the life of Jibanananda, an diverse and monotonous life. Again the publisher has announced about this novel that it is a 'biographical novel'. We will try to judge whether this declaration of the publisher is correct or not in this research article. That is, whether 'Sonali Danar Chil' has become a true personal life novel will be judged with logic. Besides, it will be seen why the novelist wrote such a novel in the present time and the relevance of the novel in the present time will also be analyzed.

Keyword: Novel, Twenty-first century, Poet, Biographical novel, Solitude, Crisis.

আধুনিক বাংলা কাব্য সাহিত্যের একজন মৃত্যুঞ্জয়ী কবি হলেন জীবনানন্দ দাশ। লোকভীরু জীবনানন্দ সবসময় আপন জগতে, কবিত্বের নির্জনতায় যেন বাস করতেন। সত্তার ভেতর থেকে, সমস্ত চেতনা দিয়ে তিনি বিশ্ববোধ ও ব্যক্তিবোধের সমন্বয়ে খুঁজেছেন। কখনোবা তিনি আত্মার গভীরে হারিয়ে গেছেন, আবার কখনোবা দূর দেশ-কালের স্মৃতি-বিস্মৃতির মধ্যে পথ হেঁটেছেন। মাইকেল মধুসূদনের মতো বহু বৈচিত্র্যময় জীবন - ধর্মান্তরিত হওয়া, মাদ্রাজে যাওয়া, ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত গিয়ে প্রতিকূল জীবন, বিবাহ বিচ্ছেদ, অর্থনৈতিক সংকট, অসীম সাহিত্য প্রতিভার তেজে বাঙালি পাঠককে চকিত করে দেওয়া এরকম কিছু ঘটেনি জীবনানন্দের জীবনে। কাজী নজরুল ইসলামের মতো দারিদ্র্যময় অনিশ্চিত জীবন, কিশোর বয়সে বাড়ি ছেড়ে দেওয়া, সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া, নাটকীয়ভাবে বিয়ে, সাহিত্যিক সভা সমিতিতে যোগদান, পত্রিকায় লেখা, রেডিও ও গ্রামোফোন রেকর্ডে বিশ্বময় বিশিষ্ট স্থান করে নেওয়ার আকর্ষণও জীবনানন্দের সমস্ত জীবনে পাওয়া যায় না। এক কথায় জীবনানন্দের জীবন ছিল বৈচিত্রহীন, একঘেয়ে। কিন্তু তাঁর জীবনকে অবলম্বন করে একবিংশ শতকে এসে লেখা হয়ে গেল উপন্যাস।

জীবনানন্দ দাশের জীবন অবলম্বনে একাধিক উপন্যাস লেখা হয়। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে প্রদীপ দাশশর্মা লিখলেন 'নীল হওয়ার সমুদ্রে' উপন্যাসটি। ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় কেতকি কুমারী ডাইসন-এর 'তিসিডোর'। যদিও এটি জীবনভিত্তিক উপন্যাস নয়। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে জীবনানন্দের লেখা 'সফলতা নিষ্ফলতা' উপন্যাসটি এর মূল অবলম্বন। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে আনিসুল হক লিখলেন 'এতদিন কোথায় ছিলেন' উপন্যাসটি। জীবনানন্দের জীবন অবলম্বনে লেখা হলেও উপন্যাসটি সার্থক ব্যক্তি জীবনভিত্তিক উপন্যাস নয়। কারণ এতে বিভিন্ন ডায়েরি, জীবনী গ্রন্থ, গবেষণা গ্রন্থ থেকে অতিমাত্রায় উদ্ধৃতি ব্যবহার উপন্যাসটিকে ভারাক্রান্ত করে দেয়। তাই উপন্যাসটি জীবনী উপন্যাস থেকে জীবনী গ্রন্থ বলেই বেশি মনে হয়। উপন্যাসটিতে জীবনানন্দের আবেগ অনুভূতিরও স্পষ্ট প্রকাশ নেই। তাছাড়া জীবনানন্দের সমকালীন সমাজ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মত ঘটনা জীবনানন্দের জীবন বা উপন্যাসটিতে কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। তবে উপন্যাসটিতে জীবনানন্দের 'বনলতা সেন' কবিতাটির উৎস সন্ধানের কুশলতাতে মুগ্ধ হতে হয়। এছাড়া ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় শাহাদুজ্জামানের 'একজন কমলালেবু' উপন্যাসটি। ২০০৯ সালে 'সোনালি ডানার চিল' নামে সুরঞ্জন প্রামাণিক লিখলেন ৪৬২ পৃষ্ঠার সুদীর্ঘ উপন্যাস। জীবনানন্দের জীবন নিয়ে অনেকগুলি উপন্যাস লেখা হলেও আমাদের আজকের আলোচনার মূলে রয়েছে 'সোনালি ডানার চিল' উপন্যাসটি।

একবিংশ শতকে উপন্যাসের ধারায় একটি অনন্য সংযোজন হচ্ছে সুরঞ্জন প্রামানিকের 'সোনালি ডানার চিল'। উপন্যাসটি সম্পর্কে প্রকাশক ঘোষণা করেছেন এটি 'জীবনীমূলক উপন্যাস'। বাংলা সাহিত্যে ব্যক্তিজীবন ভিত্তিক উপন্যাস বা জীবনীমূলক উপন্যাসের সংখ্যা খুব বেশি নয়। তার কারণ, একজন ব্যক্তির জীবনকে উপন্যাসের চরিত্র রূপে গ্রহণ করতে গেলে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। উপন্যাসের চরিত্র হুবহু বাস্তবের চরিত্রের সাথে মিল খায় না। উপন্যাসের আখ্যানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সেই চরিত্রকে এমনভাবে নির্মাণ করতে হয় যেখানে বাস্তবের মানুষটিকেও চেনা যায়, আবার উপন্যাসের চরিত্রের দাবিও মেটানো যায়। 'সোনালি ডানার চিল' উপন্যাসটির মূলে রয়েছে জীবনানন্দের জীবন। কিন্তু উপন্যাসের মূলে জীবনানন্দের জীবন থাকলেও উপন্যাসটিকে যথার্থ ব্যক্তিজীবন ভিত্তিক উপন্যাস বলা যায় কিনা অথবা প্রকাশকের ঘোষণা অনুসারে উপন্যাসটি যথার্থ জীবনীমূলক উপন্যাস হয়ে উঠেছে কিনা তা আমরা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করে দেখব।

উপন্যাসটিতে জীবনানন্দের জন্ম ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ থেকে ২২ অক্টোবর ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট ৫৫ বছরের জীবনকালের মধ্যে কিশোর বয়সে পড়াশোনার জন্য কলকাতা আসা থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় সমস্ত ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। শুধু জীবনানন্দের জীবন নয় এর সাথে সেই সময়ের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, অর্থনীতি, স্বাধীনতা আন্দোলন ও উপনিবেশিক বাতাবরণ, বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব, দাঙ্গা এবং তার ফলে দ্রুত সাংস্কৃতিক পরিবর্তন - সবকিছু এই উপন্যাসটিতে জীবন্ত করে তোলা হয়েছে। উপন্যাসটির রচনার কারণ হিসেবে ঔপন্যাসিক ভূমিকা অংশে আমাদের জানিয়েছেন –

> তখন (বিশ শতকের শেষ দশক) প্রতিদিন মনে হতো আমি একা হয়ে যাচ্ছি, কোথাও নেই আমি। তখন এক-একটা মধ্যরাত গড়িয়ে যাওয়া টের পেতাম। গাঢ় অন্ধকার আর নিস্তব্ধতা। তখন দু'জন অন্যরকম মানুষের সঙ্গে আমার দেখা হতো। একজনের সঙ্গে প্রায়ই আমার ঘরে (তাঁকে আমি অনুভব করতাম); অন্যজনের সঙ্গে মাঝেমধ্যে কফিহাউসে। প্রথমজন 'মহাপৃথিবী'র স্বপ্ন দেখতেন,

> দ্বিতীয়জনের স্বপ্ন ছিল 'বিপ্লব'। দু'জনই আপাত অসফল। এঁদের যে-কোনো একজনের জীবনের মধ্যে ঢুকে পড়া ছাড়া আমার যেন আর পরিত্রাণের পথ ছিল না। আমার এক বন্ধুর পরামর্শে জীবনানন্দের জীবনের মধ্যে ঢুকে পড়ি। [১]

তাছাড়া সাহিত্যিক মাসউদ আহমেদের নেওয়া সুরঞ্জন প্রামাণিকের সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় - জীবনানন্দের কবিতার মায়া ঔপন্যাসিককে বরাবরই অবিভূত করতো। জীবনানন্দের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে তাঁর অনুজকবি জীবনানন্দ নিয়ে কিছু বলার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন। সেই সময় তিনি নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে পড়াশোনা করে 'ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আবহমান' উপন্যাসটি লিখলেন। পরবর্তীকালে জীবনীমূলক উপন্যাস রচনার ইচ্ছে থেকে বৃহৎ আকারে জীবনানন্দের জীবন নিয়ে 'সোনালী ডানার চিল' লিখলেন। [২]

'সোনাল ডানার চিল' উপন্যাসটি রচনায় ঔপন্যাসিক জীবনানন্দের প্রতি দায়বদ্ধতা যেমন দেখিয়েছেন তেমনি বহুবিধ ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। ঔপন্যাসিক উপন্যাসটি রচনায় প্রচুর পরিমাণ তথ্য, নিকট আত্মীয়দের লেখা আলোচনা, জীবনী পড়েছেন। তবে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন স্বয়ং কবির লেখা ডায়েরী, গল্প, উপন্যাস, তথ্যনিষ্ঠ কথোপকথন, চিঠিপত্র ইত্যাদির উপর। তাই বিপুল ক্ষেত্রে জীবনানন্দের জীবনী ও জীবনবোধের সঙ্গে উপন্যাসের কাহিনিগত, তথ্যগত ও অনুভূতিগত মিল লক্ষ্য করা যায়। ঔপন্যাসিক উপন্যাসটিতে জীবনানন্দকে আনন্দ এবং লাবণ্যপ্রভাকে প্রভা নামে অভিহিত করেছেন। তবে এতে তাঁদের নিজস্ব পরিচয় প্রচ্ছন্ন রাখার কোন প্রয়াস নেই।

উপন্যাসের শুরু হয় কিশোর জীবনান্দের পড়াশোনার জন্য কলকাতা যাওয়ার প্রস্তুতি দিয়ে। পিতা সত্যানন্দ ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিনিধি। তাঁর বিশেষ পরিচিতি সূত্রে জীবনানন্দ কলকাতায় অক্সফোর্ড মিশন হোস্টেলে বাস করার সুযোগ পান। এই হোস্টেলে বাস করেই তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজি অনার্স নিয়ে বি.এ পাস করেন। একই বছর 'ব্রহ্মবাদী' পত্রিকায় 'বর্ষ-আবাহন' নামে প্রথম মুদ্রিত কবিতার মাধ্যমে সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর অনুপ্রবেশ ঘটে। এরপর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এম.এ পাস করেন। তখনও তাঁর জীবনে কোন বিদ্রোহ ছিল না। কলকাতা নাগরিক বৃত্তের আরো পাঁচটা বহিরাগত লোকের মতোই কেটেছে তাঁর কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবন। এম.এ পাস করার পরের বছর কলকাতার সিটি কলেজে ইংরেজি বিভাগে টিউটর পদে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে চিত্তরঞ্জন দাশের প্রয়াণে 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় 'দেশবন্ধুর প্রয়াণে' শিরোনামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। এই কবিতাটি লেখার পর তাঁর মা কুসুমকুমারী দেবী জানিয়েছিলেন–

> চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে লিখেছো, ভালোই করেছো, কিন্তু রামমোহনের ওপর লিখতে বলেছি তোমাকে, মহর্ষির ওপরেও! [৩]

সাহিত্যজগতে 'কল্লোল' পত্রিকার আবির্ভাব ঘটলে পত্রিকা অফিসে জীবনানন্দ ডাক মারফৎ একটি কবিতা পাঠান । এই কবিতার সূত্রে কল্লোল কবি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সঙ্গে তাঁর ভালো বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সাহিত্যজীবন ও কর্মজীবন মেলে ভালোই চলছিল হঠাৎ তাঁর কর্মজীবনে বিপত্তি আসে। হিন্দু - ব্রাহ্মে বিরোধ রামমোহনের সময় থেকেই চলে আসছিল। সিটি কলেজের হিন্দু ছাত্ররা সরস্বতী পূজা করতে চাইলে আনন্দ বলেন - প্রত্যেক মানুষের ধর্মাচরণের স্বাধীনতা থাকা উচিত। এটা অবশ্যই আমার বিশ্বাস।[৪]

কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ পূজা না করার নোটিশ জারি করায়, শুরু হয় ছাত্র বিক্ষোভ। শেষ পর্যন্ত দুই ধর্মের লড়াইয়ে আরো দশজন অধ্যাপকের সঙ্গে জীবনানন্দেরও চাকরি চলে যায়। বিভিন্ন জায়গায় চাকরির চেষ্টা করে ক্লান্ত- অবসন্ন জীবনানন্দ কিছুদিনের জন্য দেশে ফিরেন। বাড়ি ফিরে জীবনানন্দের বোন বুলুর বন্ধু বনির সাথে তাঁর পরিচয় হয়। এই পরিচয় ধীরে ধীরে প্রেমে পরিণত হলেও তা সফল হয়নি।

কিছুদিন পর অশ্বিনীকুমার দত্তের ভাইপো সুকুমার দত্তের সহযোগিতায় রামযশ কলেজে চাকরির সূত্রে তিনি দিল্লি চলে যান। কিন্তু দিল্লির পরিবেশে তিনি নিজেকে কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারছিলেন না। তাছাড়া পারিবারিক উদ্যোগে তাঁর বিয়ের ব্যবস্থা করায় মাত্র চার মাস চাকরি করেই তিনি আবার বরিশালে ফিরে আসেন। বিয়ে হয় লাবণ্যপ্রভার সাথে। এক বছরের ব্যবধানে জন্ম হয় মেয়ে মঞ্জুশ্রীর। কিন্তু জীবনানন্দের দাম্পত্য জীবন সুখের হতে পারেনি। কারণ বিয়ের কিছুদিন পরই প্রভা জানতে পারে জীবনানন্দ চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। জীবনানন্দের কর্মহীনতায় নিত্য অভাব-অনটনের মধ্যে প্রভা-আনন্দের সম্পর্কের মধ্যে প্রেম-ভালবাসা তৈরি হওয়ার আগেই তাদের সম্পর্কে তিক্ততা চলে আসে –

> কোথায় প্রেম? বিবাহিত জীবন একটা চুক্তির জীবন। অভাব- অনটনে নানা আশার অচরিতার্থতায় সে চুক্তিও কেমন ধ'সে যায়— বেশ টের পাচ্ছে আনন্দ; তবু টিকে থাকে, টিকে আছে এখনও, করুণা-মমতায়; প্রেম নেই কোথাও- কারও প্রতি কোনো মুগ্ধতা নেহ, প্রভার রূপ ঝ'রে গেছে, চোখ-দুটো ফ্যাকাসে নিরক্ত ক্লান্ত- স্বভাব-মেজাজ কেমন খিটখিটে হয়ে উঠেছে। [৫]

এরই মধ্যে প্রকাশিত হয় কবির 'ঝরা পালক' কাব্যগ্রন্থটি। লেখা হয় 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থের নানা কবিতার সাথে বিভিন্ন গল্প, উপন্যাস। চার-পাঁচ বছর বেকার থাকার পর তিনি বরিশালে ব্রজমোহন কলেজে অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। পরের বছর জন্ম হয় ছেলে সমারানন্দের। একই বছর প্রকাশিত হয় তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'। কাব্যটি পাঠকমহলে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। কাব্যটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ প্রশংসা করে তাঁর কবিতাকে 'চিত্ররূপময়' আখ্যা দেন। বুদ্ধদেব বসু কাব্যটি পড়ে জীবনানন্দের ভক্তপাঠক হয়ে উঠেন। এরপর ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে 'বনলতা সেন' এবং ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে 'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

এরই মধ্যে বিপুল সংগ্রামের পর দেশভাগের মত দুঃখ বুকে নিয়ে ভারতবাসী স্বাধীনতা লাভ করে। দেশভাগের আগেই জীবনানন্দ সপরিবারে বরিশাল ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন। ফলে বাধ্য হয়ে ব্রজমোহন কলেজের চাকরিতে ইস্তফা দিতে হয়। চাকরি চলে যাওয়ার পর সংসারের অভাব-অনটন আরো বেড়ে যায়। যদিও কলকাতায় এসে তিনি 'স্বরাজ' পত্রিকায় রবিবারের বিভাগীয় সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন। কিন্তু এতে তেমন কোনো আয় ছিল না। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সাথে জীবনানন্দের সংসারের প্রতি উদাসী ভাবের ফলে সাংসারিক অশান্তিও আরো তীব্র রূপ নেয়। তাই আনন্দ ভাবতে বাধ্য হয় –

> আমি একটা ব্যর্থ বাবা, অসফল স্বামী। তবু কেন বেঁচে আছি? আমার কাছে কারও কোনো প্রত্যাশা নেহ, তবু কেন এই একসঙ্গে থাকা?[৬]

দাম্পত্য জীবনের পাশাপাশি তাঁর কর্মজীবনেও চলে সংকটময় পরিস্থিতি। বারবার কর্মে যোগ দেওয়া ও কর্মচ্যুতি যেন জীবনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। কলকাতা এসে তিন-চার বছরের মধ্যে প্রথম খড়গপুর কলেজে এরপর বড়িশা কলেজে যোগদান করেন। সেখান থেকে ডায়মন্ডহারবার ফকিরচাঁদ কলেজে অধ্যাপনার জন্য আবেদন করেও যাতায়াতের অসুবিধার জন্য তিনি চাকরিতে যোগদান করেননি এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে হাওড়া গার্লস কলেজে যোগ দিয়ে কর্মজীবন অব্যাহত রাখেন। এই সময়ে 'সাতটি তারার তিমির', 'বনলতা সেনে'র সিগনেট সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে ১৪ অক্টোবর দেশপ্রিয় পার্কের কাছে ট্রাম দুর্ঘটনায় তিনি গুরুতর ভাবে আহত হন এবং ২২ অক্টোবর তাঁর মৃত্যু হয়। ঔপন্যাসিকের ভাষায় –

> নিভে যাচ্ছে তারার আকাশ... একটা কালো ক্যানভাস আনন্দর চোখের সামনে, ক্যানভাস জুড়ে অন্ধকারের আবর্ত... একটা সুড়ঙ্গ টেনে নিচ্ছে তাকে... [৭]

উপরিউক্ত কাহিনিবলয়ের মধ্যে বর্ণিত সমস্ত ঘটনাই জীবনীর সাথে তথ্যগত মিল রেখে ঔপন্যাসিক বর্ণনা করেছেন। কোথাও দেখা যায় ঔপন্যাসিক সরাসরি উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন 'আমার মা-বাবা' গ্রন্থ থেকে, কখনো ভূমেন্দ্র গুহের বই থেকে, কোথাও জীবনানন্দের ইংরেজি ও বাংলা কবিতা থেকে, কোথাও তাঁর ডায়েরী থেকে, কোথাও অপর কোন গবেষণাগ্রন্থ থেকে। এ কথা সত্য, ঔপন্যাসিক বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে প্রচুর তথ্য ব্যবহার করেছেন কিন্তু সেই সাথে তথ্যকে সন্নিবেশনের কাজটিও তিনি পটু হাতে করেছেন। তাছাড়া ঔপন্যাসিক উপন্যাসটিতে জীবনানন্দের জীবনবোধকে আত্মস্থ করে কাল্পনিক সংলাপের মাধ্যমে জীবনানন্দ চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। উপন্যাসে অনেক জায়গায়ই জীবনানন্দের এই জীবনবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন –

> ১)মাঝেমধ্যে উদ্দেশ্যহীন হাঁটতে আনন্দর ভালো লাগে। এটা অবশ্য তার পুরনো ব্যাপার। হাঁটতে হাঁটতে পুরনো ধ্বসংস্তূপ, বনজঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার একটা আলাদা আনন্দ আছে। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে সে পুরনো দিনকে যেন স্পষ্ট দেখতে পায়। কিংবা সেই অনুষঙ্গে তার মন কোথায়-কোথায় চ'লে যায়- মিশর, ব্যাবিলন, গ্রীস... কিন্তু এখানে সে-সুযোগ নেই। পথঘাটও খুব একটা চেনে না। একটা পথ ধ'রে হাঁটতে-হাঁটতে কোথাও তো পৌঁছানো যায়। টুকরো টুকরো দৃশ্য- কেমন অস্বাভাবিক মনে হয়, কুষ্ঠরোগী, ভিখারি, ফুটপাথ-গেরস্থালি- গঙ্গার বগলানো ঘোলা জলে দেহাতি মানুষজনের স্নান, অদ্ভুত মনে হয় সব।[৮]
>
> ২)প্রতি মুহূর্তে ফিউচার বর্তমান হয়ে যাচ্ছে, বর্তমান অতীত- অতীত ফিরে আসছে স্বপ্নে, অনেক সময় যেন জাগরণের মধ্যেই কেমন ইল্যুশন টের পায় আনন্দ- রুক্ষ পাথুরে জমি চারিদিকে, একটিও নদী নেই ধারেকাছে; অথচ সে স্টিমার দেখেছে, শুনেছে জাহাজের ভোঁ- সবুজ তটরেখা। সে আজ পরিযায়ী পাখির মতো এইখানে এসেছে- পাখিদের স্মৃতিতে কি ফেলে আসা দেশের এমন মায়া জেগে ওঠে? স্মৃতির সঙ্গে কি জন্মমহোৎসবে মেতে ওঠা যায়? এখানে তেমন পাখি নেই। চড়ই-কাক, কিছু পায়রা- বুলবুলি-টুনটুনি, দোয়েল-শ্যামা এমন-কী মাছরাঙা আনন্দর চোখের সামনে নেচে বেড়ায় স্মৃতিতে, স্বপ্নে... এমনই তো হওয়ার কথা অন্তত ওই চড়ই-কাকদের, মানে আনন্দে থাকার কথা- একেই বোধহয় বলে জীবনের পরিহাস- এরা বাস করে আনন্দ পর্বতে, নিরানন্দে... যেমন আমি, আনন্দ- বিষাদের কারবারি, চিরবিষণ্ণ; এমন সিনিক হওয়ার কোনো মানে নেই আনন্দ।[৯]

৩)আমি যেন মৃত পচা মানুষ- মাছির উৎপাত দেখে তেমনই মনে হয়, যেন আমার হৃৎপিণ্ডের দগদগে ক্ষত থেকে চুঁইয়ে পড়া রসরক্তের আস্বাদ নিতে চায় ওরা- কোথাও কোনো শুশ্রূষা নেই।[১০]

৪)হৃদয়ের অবিরল অন্ধকারের ভিতর সূর্যকে ডুবিয়ে ফেলে আবার ঘুমোতে চেয়েছিলাম তুমি, অন্ধকারের স্তনের ভিতর, যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থাকতে চেয়েছিলাম...[১১]

উপন্যাসটির সর্বত্র ছড়িয়ে আছে সমকালীন সময়, সমাজ ও রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ। একজন ব্যক্তি মানুষকে জানতে হলে আগে জেনে নিতে হয় সমকালীন সময় ও সমাজ ব্যবস্থাকে। তাই ব্যক্তি জীবনভিত্তিক উপন্যাসগুলিতে সেই ব্যক্তির সমকালীন সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে উল্লেখ থাকা খুবই জরুরী। সমাজ, রাজনীতি সম্পর্কিত এইসব বর্ণনা উপন্যাসটিকে আরো বাস্তবসম্মত ও জীবন্ত করে তোলে। আলোচ্য উপন্যাসটিতে যার অজস্র দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায় –

১) খবরের কাগজ থেকে আনন্দ যতটুকু জেনেছে তাতে মনে হয়েছে চৌরিচৌরার ঘটনা না-ঘটলে গান্ধিজী পিছিয়ে আসতেন না। চৌরিচৌরার সঙ্গে জালিয়ানওয়ালাবাগের মিল রয়েছে এক জায়গায়। দু'জায়গাতেই হত্যা সংঘটিত হয়েছে। এক হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ 'নাইট' ত্যাগ করলেন আর একটি প্রতিবাদে গান্ধিজী আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন। তাও এমন একটা সময়, যখন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সাধারণ মানুষ মনে করছেন 'গান্ধীরাজ' এসে গেছে- এই তো গেল-বছরের গোড়ার দিকে রাজশাহী জেল ভেঙে প্রায় সাতশ জন কয়েদি ঘোষণা করেছিল 'গান্ধীরাজ' সুসমাচার- হ্যাঁ, খবরটা পড়ার পর আনন্দর মনে হয়েছিল, সু- সমাচারই বটে- গান্ধীরাজ মানে ঘৃণার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের হাতিয়ার প্রেম, গান্ধীরাজ মানে।[১২]

২)দেশ ক্রমশ দাঙ্গাপ্রবণ হয়ে উঠছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের ঝিমিয়ে পড়াই নাকি তার কারণ- এরকম শুনেছে আনন্দ। কেউ বলছে, 'দাঙ্গা ব্রিটিশ রাজনীতির অঙ্গ।' কেউ আবার বলছে, 'এর রুট অনেক গভীরে- ভারতবর্ষের সব মুসলমান তো আর আরব থেকে আসেনি সবাইকে জোর ক'রেও মুসলমান করা হয়নি মুসলমান হলো কেন? ওই কারণের মধ্যেই রয়েছে দাঙ্গার প্রকৃত কারণ।' তার পক্ষে যুক্তি জোরালো করার জন্য সে বলেছিল, 'লক্ষ ক'রে দেখবেন, মজবুত মুসলিম শাসনে দাঙ্গার কোনো ইতিহাস নেই। দাঙ্গার প্রকোপ বেড়েছে ইংরেজ জমানা দৃঢ়মূল হবার পর আর স্বায়ত্তশাসনের দাবি প্রবল হবার পর থেকে চলছে'[১৩]

৩)এতদিন দেশের রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমান-শিখ ব্যাপারটা ইংরেজদের কাছে তুরুপের তাস ছিল, সময়মতো যে যেমন পেরেছে খেলেছে। এর সঙ্গে গতবছর থেকে শুরু ১৯৮ হয়েছে হিন্দুদের মধ্যে উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের বিরোধ- যেন এ-বিরোধ আগে ছিল না, ছিল বলেই তো গত দশক থেকে একটা আন্দোলন ঘনীভূত হ'তে পেরেছে বাবাসাহেব আম্বেদকরের নেতৃত্বে; [১৪]

৪)এই তো যুদ্ধ আমাদের দোরগোড়ায়- কার্য্য চলছে, উড়োজাহাজ দেখলেই বিস্ফারিত চোখ, হৃৎপিণ্ডের দদপানি- সাইরেনও বাজছে বোমা তো ফাটছে কোথাও ধ'সে যাচ্ছে, জ্ব'লে যাচ্ছে জীবন, ছিন্নভিন্ন, সময় তো চলছে তবু- সময় মেপে কি বোমা পড়ে? [১৫]

৫)একটা গুজব ছড়িয়েছে- 'গান্ধিজী নাকি খুন হয়েছেন।' আনন্দ বসলো। ভাবলো, যেন গুজবই হয়। গুজবের কি এত শক্তি? একটা বাড়ির সামনে জটলা, নিথর, তাদের কান পেতে থাকা লক্ষ ক'রে আনন্দ বুঝতে পারলো, রেডিয়ো শুনছে। মহাত্মা গান্ধী খুন। অততায়ী নিশ্চয় মুসলমান। আবার দাঙ্গা। আনন্দ একটু শিউরে উঠলো।[১৬]

সামাজিক প্রেক্ষাপটে, বণিকসভ্যতা ভিত্তিক এই আধুনিক সময়ের বিরুদ্ধে জীবনানন্দ এক 'শান্ত বিপ্লবী'। আধুনিক সভ্যতা তার প্রখর আলোর আয়োজনে যে অন্ধকার সৃষ্টি করেছে, জীবনানন্দের ভাষায় যা 'অদ্ভূত আঁধার'- তাঁর স্বরূপ উন্মোচনে জীবনানন্দ পথিকৃৎ। যাঁরা অন্ধকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, যুদ্ধ জারি রেখেছেন, আগামী দিনে যাঁরা সৈনিক হবে- মানবিক সেনা, তাঁদের সামনে জীবনানন্দের ব্যক্তিগত লড়াই যেমন প্রেরণার বিষয়। তাঁর জীবন আলেখ্য আমাদের 'অপ্রেমের থেকে প্রেমে, গ্লানি থেকে আলোকের মহাজিজ্ঞাসায়' নিয়ে যেতে পারে[১৭] - আর এইখানেই বর্তমান সময়ে জীবনানন্দের জীবনের প্রাসঙ্গিকতা।

উপন্যাসিক সুরঞ্জন প্রামাণিক গবেষকের নিষ্ঠা নিয়ে গভীর অধ্যবসায়ের সঙ্গে জীবনানন্দের জীবনকে পাঠ করেছেন। গোয়েন্দার মতো তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করেছেন তাঁর জীবনের বহু অজ্ঞাত অজানা তথ্যকে। কিন্তু জীবনীগ্রন্থ রচনায় যেমন সন তারিখের স্পষ্ট উল্লেখ থাকে, উপন্যাসটিতে কোথাও কোনো সন তারিখের উল্লেখ নেই। তাহলে কী উপন্যাসটিকে জীবনভিত্তিক উপন্যাস বলা যাবে না? জীবনীগ্রন্থ ও ব্যক্তিজীবন ভিত্তিক উপন্যাসের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে বিস্তর। জীবনীগ্রন্থে দেখা যায় তথ্যের যথাযথ প্রয়োগ, এতে কল্পনার স্থান থাকে খুবই কম। গ্রন্থাকার কোনো কারণেই তথ্যের বিকৃতি ঘটাতে পারেন না বা চরিত্রকে নিজের মতো করে বর্ণনা করতে পারেন না। কিন্তু ব্যক্তিজীবন ভিত্তিক উপন্যাসের দাবি অন্যরকম। ব্যক্তিজীবন ভিত্তিক উপন্যাস হল এমন এক ধরনের উপন্যাস যা একই সাথে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনের কথা বলে অন্যদিকে তা উপন্যাসও। কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির সমগ্র জীবন বা জীবনের কোন খন্ড অংশ যখন একজন সাহিত্যিকের কলমে তথ্যের সাথে কল্পনার মিশ্রণে রূপলাভ করে, তখন সেটা হয়ে ওঠে ব্যক্তিজীবন ভিত্তিক উপন্যাস। তাই উপন্যাসটিতে সন তারিখের উল্লেখ না থাকলেও জীবনীসম্মত বহু তথ্যের সাথে ঔপন্যাসিকের বাস্তবসম্মত বর্ণনা, কাল্পনিক সংলাপ উপন্যাসটিকে সার্থক জীবন ভিত্তিক উপন্যাসে পরিণত করেছে।

তথ্যসূত্র:

1) সুরঞ্জন প্রামাণিক, সোনালি ডানার চিল, প্রথম প্রকাশ, ২০০৯, উবুদশ, কোলকাতা, ভূমিকা অংশ
2) বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য উবুদশ, অক্টোবর ২০২২, কথাকার সুরঞ্জন প্রামাণিক সংখ্যা, পৃ. ৪৬৬ – ৪৭৯
3) সুরঞ্জন প্রামাণিক, সোনালি ডানার চিল, প্রথম প্রকাশ, ২০০৯, উবুদশ, কোলকাতা, পৃ. ৪৩
4) তদেব, পৃ. ৫২
5) তদেব, পৃ. ১২১
6) তদেব, পৃ. ৩২৩
7) তদেব, পৃ. ৪৬০
8) তদেব, পৃ. ১৯
9) তদেব, পৃ. ৮৬
10) তদেব, পৃ. ১১২
11) তদেব, পৃ. ৩৫৩
12) তদেব, পৃ. ৩৭
13) তদেব, পৃ. ৪৫
14) তদেব, পৃ. ১৮৩
15) তদেব, পৃ. ২৩১
16) তদেব, পৃ. ৩২০
17) বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য দ্বৈপায়ন, অক্টোবর - নভেম্বর ২০১৫, ১৪ বর্ষ, সংখ্যা ৬, পৃ. ১৩১ – ১৪৪

সহায়ক গ্রন্থ:

1) প্রভাতকুমার দাস, জীবনানন্দ দাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০৩, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা ৫০
2) দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত জীবনানন্দ দাশ : বিকাশ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত, প্রথম দে'জ সংস্করণ, জুলাই ২০০৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩
3) আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, জীবনানন্দ, প্রথম দে'জ সংস্করণ, জুলাই ২০০৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩
4) ভূমেন্দ্র গুহ, আলেখ্য: জীবনানন্দ, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯
5) উজ্জ্বলকুমার দাস সম্পাদিত জীবনানন্দ স্মৃতি, জানুয়ারি ২০০০,সাহিত্যম, কলকাতা ৭৩
6) অরুণেশ ঘোষ, জীবনানন্দ, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯, কবিতীর্থ, কলকাতা ২৩